যুগান্তর

তারিখ 30 JUL 2015 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কা জী সি রা জ

‘সিন্ডিকেট’ কবলিত ছাত্রলীগের গন্তব্য কোথায়?

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সদ্যসমাপ্ত কাউন্সিলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেতা নির্বাচনের যে দাবি করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ২৭ জুলাই প্রথম আলো লিখেছে, ‘ভোট হলেও অনেকটা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কথিত সিন্ডিকেট মনোনীত প্রার্থীরাই ছাত্রলীগের নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্ব তৈরির লাগাম বহুল আলোচিত সিন্ডিকেটের হাতেই থাকল বলে মনে করছেন সংগঠনের অনেকে।... ছাত্রলীগের সাবেক নেতাদের একটি অংশ ‘অনুসারীদের’ ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আনতে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন বলে অনেক দিন ধরেই সংগঠনটির ভেতরে-বাইরে আলোচনা আছে। ২০০২ সাল থেকে ছাত্রলীগের নেতা নির্বাচনে এ সিন্ডিকেট ভূমিকা রেখে আসছে। আর এক্ষেত্রে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি লিয়াকত সিকদার প্রধান ভূমিকা রাখেন বলে অভিযোগ আছে। যদিও লিয়াকত সিকদার এ অভিযোগকে ভিত্তিহীন দাবি করেছেন।... সংগঠনের একাধিক সূত্র জানায়, ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে গত শনিবার বিকালে ছাত্রলীগের সাবেক শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বৈঠকে সাইফুর ও জাকিরকে ‘সিন্ডিকেটের’ প্রার্থী হিসেবে চূড়ান্ত করা হয়। বাকি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের একথা জানিয়ে দিয়ে ওই প্যানেলের পক্ষে কাজ করতে বলা হয়।’

যুগান্তর ক’দিন ধরেই এর ওপর নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংবলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। ২৮ জুলাই ‘স্বচ্ছ বাক্সে অস্বচ্ছ ভোট’ শিরোনামে এবং লিয়াকত সিন্ডিকেটের ‘নীলনকশা’য় ৮ ধরনের ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’ উপশিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়, ‘স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে কাউন্সিলদের সরাসরি ভোটে ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হলেও নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। লিয়াকত সিন্ডিকেটের ‘নীলনকশা’ অনুযায়ী লোক দেখানো নির্বাচনের মাধ্যমে শীর্ষ দুই নেতাকে জিতিয়ে আনা হয়েছে। আর এটি বাস্তবায়ন করতে অন্তত ৮ ধরনের ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’ করা হয়েছে বলে অভিযোগ বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের। এর মধ্যে ক. তফসিল ঘোষণা করলেও ভোটার তালিকা প্রণয়নে অস্বচ্ছতা ও তা প্রকাশ না করা, খ. প্রার্থীদের কাছে ভোটার তালিকা সরবরাহ না করা, গ. সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থীদের নামের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ না করা, ঘ. তাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা নিয়ে লুকোচুরি ঙ. কাউন্সিলরদের ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়েই ব্যালট সরবরাহ করা, চ. ভোট কারচুপি, ছ. জাল ভোট দেয়া এবং জ. ভোটগ্রহণ শুরুর আগ মুহূর্তে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রার্থিতা বাতিলের আহ্বানের কথা রয়েছে।

অন্যান্য পত্রিকায়ও একই ধরনের খবর ছাপা হয়েছে। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, ছাত্রলীগের মতো একটি গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের গৌরবকে এভাবে ম্লান করা হচ্ছে। সাধারণের মতামতের ভিত্তিতে, তাদের রায়ে নেতৃত্ব নির্বাচনের বদলে কুটিল পন্থায় নেতৃত্ব ‘দখল’ করার কু-প্রবৃত্তিকে এভাবে উসকে দেয়া হচ্ছে। এ কু-প্রবৃত্তি অন্যান্য ছাত্র সংগঠনেও সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে— যা দেশে একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত রচনার পরিপন্থী। এ এক সর্বনাশা পথ। ছাত্রলীগ কেন এ খারাপ পথের ও গন্তব্যের অভিযাত্রী হবে?

এদেশের সব সাহসী ছাত্র আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বাধিকারের আন্দোলন, সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ও পর্যায়ে যারা ছাত্রলীগের মূল নেতৃত্ব কাঠামোয় ছিলেন তাদের সৎ, সাহসী, গৌরবদীপ্ত ভূমিকা বর্তমান ছাত্রলীগ প্রজন্মকে প্রেরণা জোগাতে পারে, আলো ছড়াতে পারে। এ নেতাদের কারও কারও সম্পর্কে এখন সমালোচনা হয়, হতে পারে, দলত্যাগের অভিযোগও আছে কারও বিরুদ্ধে। কিন্তু এরা যখন ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন, তখন তারা সংগঠন ও দেশকে দিয়েছেনই শুধু, নেননি কিছু। ছাত্রলীগকে তারা ঐতিহ্যমণ্ডিত করেছেন। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে থাকাকালে এদের একজনের বিরুদ্ধেও চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অসততা, নৈতিক অবক্ষয়ের কোনো অভিযোগ তাদের শত্রুরাও তোলেনি। বলতে দ্বিধা নেই, ছাত্রলীগের সেই ঔজ্জ্বল্য স্বাধীনতাত্তোর ছাত্রলীগ কতটা ধরে রাখতে পেরেছে তা এখন অবশ্যই তর্কসাপেক্ষ। ছাত্রলীগের জন্মই হয়েছিল দেশ ও জাতিকে দেয়ার জন্য, নেয়ার জন্য নয়। মূল এ জায়গাটিতে ছাত্রলীগের স্খলন নিয়ে এখন খোলামেলাভাবেই আলোচনা-সমালোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রী। ছাত্রলীগের একশ্রেণীর নেতাকর্মীর অপকর্ম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় এবং তা মূল দলের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ানোয় তিনি সংগঠনটির সাংগঠনিক নেতৃত্ব পদে ইস্তফা দেন। সারা দেশে ছাত্রলীগের একটি দুর্বিনীত অংশের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি, অস্ত্রবাজি ইত্যাদিকে সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং দেশের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান ‘বাজিকরী’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, ‘দেশ এখন বাজিকরদের হাতে’। এই খারাপ প্রবণতাই ছাত্রলীগের মধ্যে জন্ম দিয়েছে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও কোন্দলের। শোনা যায় বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রুপের কথা, সিন্ডিকেটের কথা। ছাত্রলীগের সাম্প্রতিক ও সর্বশেষ সম্মেলনেও এ সিন্ডিকেটের কথা উঠেছে। প্রিন্ট মিডিয়ায় ফলাও করে লেখা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলে নেয়া ভালো, জন্মলগ্নে ছাত্রলীগ কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন ছিল না। বরং জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনে প্রেরণাদায়কের ভূমিকা পালন করেছে। ধীরে ধীরে জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছাত্রলীগের নৈকট্য বাড়ে। ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগেরই অনুগামী-অনুসারী সংগঠনে পরিণত হয়। তারপরও গণতন্ত্র ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ছাত্রলীগ স্বতন্ত্র ও যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর আগ পর্যন্ত ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডে আওয়ামী লীগের প্রত্যক্ষ কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বরং স্বাধীন স্বতন্ত্র ভূমিকা ও লড়াই আওয়ামী লীগকে এগিয়ে দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা সংগ্রামে ও মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগের ভূমিকা অবশ্যই ইতিহাসের অন্তর্গত বিষয়।

> ছাত্রলীগ প্রাচীন সংগঠন, ক্ষমতাসীন দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকার ও সরকারি দল গণতান্ত্রিক শাসনের কথা হরহামেশাই বলে। প্রত্যাশা থাকে, তারা নিজেরা গণতন্ত্রের চর্চা করবে এবং অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করবে, পথ দেখাবে। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের নামে ছাত্রলীগের মতো একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব যেভাবে কথিত একটি সিন্ডিকেটের কাছে কুক্ষিগত করে দেয়া হল, তাতে অন্যরাও একই পদ্ধতির চর্চা করবে।

স্বাধীনতার পর ছাত্রলীগ বদলে যায়। তাদের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কোনো প্রেরণাদায়ক ভূমিকা জাতীয় রাজনীতিতে আর লক্ষ করা যায়নি। পরিণত হয় আওয়ামী লীগের লেজুড় সংগঠনে। বঙ্গবন্ধুর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের পর ছাত্রলীগ আরও বেশি পথ হারায় বলে স্পষ্ট হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার চেয়ে ক্ষমতার রাজনীতি ছাত্রলীগকে প্রায় গিলে ফেলে। এমন একটা সময় আসে, যখন আওয়ামী লীগও ছাত্রলীগের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। বিরক্ত হন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগের আবারও ক্ষমতায় ফিরে আসার পেছনে ছাত্রলীগ যেমন যথেষ্ট অবদান রেখেছিল, দলীয় সরকারের ভাবমূর্তি বিনাশের দায়ও তাদের কম নেই। তখনই ছাত্রলীগের ধার ভোঁতা হয়ে যায়। ফলে ওয়ান-ইলেভেনের পর লড়াই-সংগ্রামে ঐতিহ্যবাহী ছাত্রলীগকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। শেখ হাসিনা দ্বিতীয় দফা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ছাত্রলীগ হয়ে ওঠে আরও বেপরোয়া, দুর্বিনীত। রাজনীতি, আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়, লোভ-লালসার পঙ্কিলে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে অনেকে। শুধু ঢাকাতেই নয়, সারা দেশেই এ প্রবণতা শুধু ছাত্রলীগ-আওয়ামী লীগের জন্যই নয়, দেশের গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের জন্যও বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। ছাত্র সংগঠন, ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই আমাদের মতো দেশে জাতীয় রাজনীতির এবং দেশের নেতৃত্ব নির্মিত হয়। এ জায়গাটা নষ্ট হয়ে গেলে এর প্রডাক্টও ভালো হওয়ার কথা নয়। যে কোনো দেশ ও জাতির জন্য এটি হতাশার কথা।

আজকের আলোচনা শুধু ছাত্রলীগকে নিয়ে, তাদের সদ্যসমাপ্ত কাউন্সিলে [illegible] সিন্ডিকেটের [illegible] প্রার্থীদের [illegible] ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংকে কেন্দ্র করে। প্রচার করা হয়েছে গোপন ব্যালটে সংগঠনের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে। স্বীকার করতে হবে, ছাত্রলীগ এখন রাষ্ট্রক্ষমতার সুবিধাভোগী একটি সংগঠন হিসেবে অনেক বড় ও প্রভাবশালী সংগঠন। প্রধান প্রতিপক্ষ ছাত্রদল এখন সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত। ছাত্রলীগের মতো বড় সংগঠনে নেতৃত্ব প্রত্যাশীও বেশিই হওয়া স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক সংগঠনে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য ও প্রকৃত জনপ্রিয় নেতৃত্ব বেরিয়ে আসে, যদি সে নির্বাচনটি সংগঠনের সবার অংশগ্রহণমূলক হয়। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, সদ্যসমাপ্ত কাউন্সিল একটি সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাদের পছন্দের বাইরের কোনো যোগ্য প্রার্থী মূল পদগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই আসতে পারেনি। ব্যালট বাক্সটি স্বচ্ছ থাকলেও ব্যালট শক্তি প্রয়োগের প্রক্রিয়াটি মোটেই স্বচ্ছ ছিল না বলে অভিযোগ বেশ জোরালো। ছাত্রলীগে সবাই চাঁদাবাজ, ধান্ধাবাজ, স্বার্থবাজ এমন কথা বলব না। অবশ্যই এ বিরাট সংগঠনে অনেক কমিটেড রাজনৈতিক আদর্শবাদী নেতাকর্মীও আছেন। কিন্তু পাদ প্রদীপের আলোয় তারা আসতে পারেননি বলেই বোঝা যাচ্ছে। এতে সংগঠনের একটি স্থায়ী সংকট তৈরি হয়ে গেল।

মুশকিলের বিষয় হচ্ছে, প্রকাশিত খবর থেকে বোঝা যায়, ছাত্রলীগের পুরনো নেতাদের একটি বড় অংশ, এমনকি আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বও অভিযুক্ত সিন্ডিকেটের পক্ষে পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করেছেন। এটাই আতংকের বিষয়। প্রশ্ন উঠেছে, তারা কেন এটা করলেন? ছাত্রলীগ তার অতীত ঐতিহ্য ও গৌরব ফিরিয়ে এনে আবার একটি আদর্শবাদী সংগঠনে পরিণত হোক তা কি তারা চান না? বঙ্গবন্ধু তো ছাত্রসমাজ ও ব্যাপক জনসমাজের জন্য নিবেদিতপ্রাণদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। তার আমলে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব কাঠামোর দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়। কিন্তু এখন তেমন হচ্ছে না কেন? এখন কেন মুক্তমনা, দলদাসত্ববিরোধী, কিন্তু দলপ্রিয় রাজনীতি সচেতন আদর্শবাদীদের অন্তত নেতৃত্বের জন্য প্রতিযোগিতায় শামিল হওয়ার সুযোগও রাখা হচ্ছে না? ‘সিন্ডিকেট কোটারি’র কথা বেশ কিছুদিন ধরেই সংগঠনের ভেতরে-বাইরে আলোচনা হচ্ছিল— মিডিয়ায় এসেছে তো সেসব আলোচনা-সমালোচনার সূত্র ধরেই। মূল দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতারা চোখ বুজে ছিলেন বলেই তো বোঝা যায় প্রকাশিত খবরে। কিন্তু কেন?

নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি করা হয়েছে বলে এখন যা বলা হচ্ছে, প্রকাশিত খবরাখবর তা সমর্থন করে না। দেশের মেইনস্ট্রিম সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে প্রথম আলো ও যুগান্তরে চোখ ফেললেই স্পষ্ট বোঝা যায়, যা বলা হচ্ছে তা সত্য নয়। কাউন্সিলর নির্বাচনে অনিয়মের কথা উঠেছে। বলা হচ্ছে সিন্ডিকেটের যারা নিয়ন্ত্রক, তাদের মনোনীত প্যানেলে যারা ভোট দেবে, সারা দেশে বেছে বেছে তাদেরই কাউন্সিলর করা হয়েছে। যোগ্য ও শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতিযোগিতায় আসতে বাধা দেয়া হয়েছে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারে বাধ্য করা হয়েছে। আবার গণভবন থেকে বিফল মনোরথে ফিরে আসা যোগ্য ও প্রতিশ্রুতিশীলরা প্রার্থিতা হয় প্রত্যাহার করেছে অথবা জমাই দেয়নি। বিপদের কথা হচ্ছে, শাসক দলের সহযোগী সংগঠনে ‘প্রতারণাশ্রয়ী গণতন্ত্রের’ চর্চা যদি শাসক দলেরই মনোভাবের প্রকাশ হয়, তা জনমনেও আতংক ছড়াবে। জনগণের সামনে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির সংসদ নির্বাচনের অভিজ্ঞতা আছে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ৩ সিটি নির্বাচনের অভিজ্ঞতাও আছে। কোনোটাই প্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। দলে-অঙ্গ দলে-সহযোগী দলেও যদি প্রেরণাহীন কর্মকাণ্ডের প্র্যাকটিস চালু হয় এবং এর চর্চা অব্যাহত থাকে, তা দেশের গণতন্ত্রের জন্য শুভ নয়। যারা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে এবং মজা বা ফায়দা লুটছে, ভবিষ্যতের জন্য তারা এ ব্যবস্থাকেই লক্ষ্য অর্জনের আসল পথ হিসেবে বেছে নেবে। এতে দলও আখেরে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শুধু তাই নয়, ছাত্রলীগ প্রাচীন সংগঠন, ক্ষমতাসীন দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকার ও সরকারি দল গণতান্ত্রিক শাসনের কথা হরহামেশাই বলে। প্রত্যাশা থাকে, তারা নিজেরা গণতন্ত্রের চর্চা করবে এবং অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করবে, পথ দেখাবে। কিন্তু নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি গঠনের নামে ছাত্রলীগের মতো একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব যেভাবে কথিত একটি সিন্ডিকেটের কুক্ষিগত করে দেয়া হল, তাতে অন্যরাও একই পদ্ধতির চর্চা করবে। তাতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তা বিকাশের সব পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে, সব সম্ভাবনাই বিনাশ হবে। আওয়ামী লীগ কি তা-ই চায়?

কাজী সিরাজ : [illegible]